***History and Heritage***, Journal of the Department of Islamic History and Culture, University of Dhaka
ISSN: 3008-1653; Vol. 01, December, 2024; DoI: 10.70775/HnH/V010007

# শিনজিয়াং-এ উইঘুর সংকট: প্রেক্ষাপট ও স্বরূপ

## (The Uyghur Crisis in Xinjiang: Context and Nature)

ড. মো. সাইফুল্লাহ[*]

**Abstract**

There have been multiple reports and allegations of inhumane actions perpetrated by the Chinese government against the Uyghur Muslims in the Xinjiang Autonomous Region. These reports and allegations have exposed that Uyghur Muslims have been affected by extensive controls and restrictions, mass illogical arrests and detention, torture, mass surveillance, cultural and religious persecution, family separation, forced labor, sexual violence, violations of reproductive rights and so on. The international community describes China's treatment to Uyghurs as genocide and crime against humanity. China has committed demographic genocide by forced abortion and sterilization of Uyghur women. China has also committed cultural genocide by Sinicization of religion and culture of the Uyghurs. They have been facing one of the world's worst human rights abuses in the so called reeducation camps. Around three million Uyghurs have been detained in about five hundred camps in Xinjiang. China continues to carry out forced labour and other discriminatory work policies against them. Chinese Government denies all allegations of crimes against Uyghur Muslims. This paper has been attempted to present the background and actual condition of the Uyghur crisis by describing and analysing the information taken from various sources. In this paper descriptive and analytical methods under qualitative approaches have been followed.

**মূল শব্দ:** শিনজিয়াং, নজরদারি, ক্যাম্প, বন্ধ্যাত্বকরণ, চিনাকরণ।

Raphel Israeli যথার্থই বলেছেন, "Like any other Muslim minority living under non-Islamic rule, Chinese Muslims have faced acute problems of identity."[১] হাজার বছরের অধিক সময় ধরে মুসলমানরা চিনে বাস করলেও সেখানে তাদের অস্তিত্ব নির্ভর করে কয়েকটি বিষয়ের উপর; ১) সংখ্যাগুরুদের সাথে সম্পর্ক, ২) সংখ্যাগুরুদের মূল্যেবোধের অনুগামী পরিচয়ে পরিচিতি স্পস্ট করা, এবং ৩) সংখ্যাগুরুদের দেয়া অসত্য তথ্য মেনে নেয়া অথবা এর বিরুদ্ধে জোরালো প্রতিবাদ না করার উপর। চিনের শিনজিয়াংয়ে উইঘুর মুসলমানদের উপর সে দেশের সরকারের ধর্মীয়, অর্থনৈতিক ও রাজনেতিক নীতি পর্যালোচনা করে সাধারণভাবে বলা যায়, চিনের মুসলমানদের নিজস্ব ধর্মীয়, নৃতাত্ত্বিক ও সংস্কৃতিক ঐতিহ্য নিয়ে বসবাসের ক্ষেত্রে সংকটের তৈরি হয়েছে। তবে চিনের স্বায়ত্বশাসিত শিনজিয়াং অঞ্চলের উইঘুররা চরমতম সংকটের শিকার। কারও কারও মতে, উইঘুররা পৃথিবীর নিকৃষ্টতম মানবাধিকার অপব্যবহারের শিকার হয়েছে এবং হচ্ছে।[২] ১৯৪৯ সালে কমিউনিস্ট শাসন প্রতিষ্ঠার পর উদ্দেশ্যমূলক ও পরিকল্পিত উপায়ে উইঘুরদের প্রতি

[*] অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ই-মেইল: drmdsyfullah@du.ac.bd

বৈষম্য, অত্যাচার ও নিপীড়ন চালানো হয়েছে। কখনও পরিকল্পিত দুর্ভিক্ষ সৃষ্টির মাধ্যমে, কখনও হানদের অভিবাসনের মাধ্যমে, কখনও সাংস্কৃতিক বিপ্লবের নামে, কখনওবা সন্ত্রাসবাদ দমনের নামে উইঘুরদের প্রতি অন্যায় আচরণ করা হয়েছে। নজরদারি, ক্যাম্পে বন্দি ও নির্যাতন, বৈষম্যমূলক কর্মনীতি ও বাধ্যতামূলক শ্রম নীতি প্রয়োগ এবং সর্বোপরি ধর্ম-সংস্কৃতি পালনে বাধা সৃষ্টির মাধ্যমে তাদের মানবিক অধিকার ক্ষুণ্ন করা হয়েছে। এ প্রবন্ধে উইঘুর সংকটের প্রেক্ষাপটসহ এর বিভিন্ন দিক তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। উইঘুর সংকট যেহেতু চলমান, তাই প্রকাশিত গ্রন্থের পাশাপাশি অনলাইনে প্রকাশিত কিছু প্রবন্ধ, বিভিন্ন সংস্থার ওয়েবসাইটে প্রদত্ত প্রতিবেদন, অনলাইনে প্রদত্ত বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমের তথ্য-উপাত্ত প্রবন্ধ রচনায় উৎস হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। প্রবন্ধটি রচনায় প্রাপ্ত তথ্যাদির উপর ভিত্তি করে গুনগত গবেষণার (Qualitative Research) আওতাধীন বর্ণনামূলক ও বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতি (Descriptive and Analytical methods) অনুসরণ করা হয়েছে।

**উইঘুর ও শিনজিয়াং-এর পরিচয়**

উইঘুর মূলত একটি নৃতাত্ত্বিক জাতি। উইঘুরদের বেশিরভাগ মুসলিম। উইঘুর একইসাথে তুর্কি সমগোত্রীয় একটি ভাষার নাম এবং এ ভাষার সাথে তুর্কি ভাষার মিল রয়েছে। এই জনগোষ্ঠীর নিজস্ব ভাষা (উইঘুর ভাষা) ও সংস্কৃতি রয়েছে। মধ্য এশিয়ার তুর্কিস্তান ও চিনের কাশগড় এলাকা ছিল তাদের আদি নিবাস। World Uyghur Congress (WUC) এর মতে, প্রায় চার হাজার বছর পূর্বে তাদের উৎপত্তি।[৩] তাদের উৎপত্তি মধ্য এশিয়ায় হবার কারণে এ অঞ্চলের জাতিসমূহের সাথে তাদের নৃতাত্ত্বিক মিল খুঁজে পাওয়া যায়। পরবর্তীতে তারা মঙ্গোলিয়া এবং সেখান থেকে উত্তর-পশ্চিম চিনে ছড়িয়ে পড়ে বলে মত পাওয়া যায়। তবে আধুনিক পশ্চিমা বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন যে, শিনজিয়াং-এর বর্তমান উইঘুররা পূর্বতন মঙ্গোলিয়া রাজ্যের উইঘুরদের উত্তরসূরি নয়; বরং তারা এখানকার প্রাচীন উইঘুরদের উত্তরসূরি। WUC এর মতে, চিনের ভিতরে ও বাইরে প্রায় ২ কোটি উইঘুর বসবাস করছে।[৪] চিনের সরকারি হিসবে অনুযায়ী বর্তমানে চিনে প্রায় এক কোটি আঠারো লক্ষ উইঘুর বসবাস করছে। তারা মূলত শিনজিয়াং উইঘুর স্বায়ত্বশাসিত প্রদেশের অধিবাসী। অন্যরা উজবেকিস্তান, কাজাখস্তান, কিরঘিজিস্তান, তুর্কমেনিস্তান, পাকিস্তান, তুরস্ক, যুক্তরাষ্ট্র, সৌদি আরব, রাশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, আফগানিস্তান, জাপান, সুইডেন, কানাডা, জার্মানি, ফিনল্যান্ড, মঙ্গোলিয়া ও ইউক্রেনসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বসবাস করছে। উইঘুররা মূলত তিন ধরণের মতাদর্শ ধারণ করে; ১) কিছু অংশ আলাদা স্বাধীন রাষ্ট্র চায়, ২) কিছু অংশ চিনের সাথে সংযুক্ত থেকে স্বায়ত্বশাসন ও আলাদা সংস্কৃতি লালন করতে পছন্দ করে, এবং ৩) কিছু অংশ চিনের সিস্টেমের সাথে একীভূত হতে চায়।

শিনজিয়াং-এর সরকারি নাম শিনজিয়াং উইঘুর স্বায়ত্বশাসিত অঞ্চল (Xinjiang Uygur Autonomous Region)। চিনের ৫টি স্বায়ত্বশাসিত অঞ্চলের বা প্রদেশের মধ্যে শিনজিয়াং অন্যতম।[৫] স্বাধীনতাকামী উইঘুরদের নিকট এটি পূর্ব তুর্কিস্তান (East Turkestan) নামেও পরিচিত। ঐতিহাসিক সিল্ক রোডের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্ট্রাটেজিক পথ হিসেবে শিনজিয়াং সবসময় গুরুত্বপূর্ণ এলাকা হিসেবে মর্যাদা পেয়ে থাকে। এটি চিনের মোট ক্ষেত্রফলের ৬ভাগের ১ভাগ। এর বেশিরভাগ এলাকা মরুভূমি। এখানে বিশ্বের ৫ভাগের একভাগ তুলা উৎপাদিত হয় এবং অঞ্চলটি তেল ও গ্যাস সমৃদ্ধ। এ এলাকা থেকে অপরিশোধিত তেল বেইজিং-এ পৌঁছে। শিনজিয়াং-এর রাজধানী উরুমচি (Urumqi)। কাশগড় (কাশি) এর অন্য একটি প্রধান শহর। শিনজিয়াং ‘China National Highway Planning (2013-2030)’ এর গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ১০হাজার কিলোমিটারেরও বেশি দীর্ঘ এ হাইওয়ে শিনজিয়াং-এর

মরুভূমির মধ্যদিয়ে আড়াআড়িভাবে অতিক্রম করে গুয়াংশি প্রদেশের তংশিয়াং পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। এই হাইওয়ের সাথে এশিয়ার বিভিন্ন হাইওয়ের সংযোগ স্থাপন করার পরিকল্পনা রয়েছে। অঞ্চলটি একইসাথে 'China-Pakistan Economic Corridor (CPEC)'এর প্রবেশদ্বার। ৩হাজার কিলোমিটার ব্যাপি এই নেটওয়ার্ক প্রজেক্টের উদ্দেশ্য হলো মধ্যপ্রাচ্য হতে চিনের জ্বালানি আমদানী নিরাপদ করা এবং যোগাযোগ পথের দূরত্ব কমানো। ফলে চিনের নিকট শিনজিয়াং অর্থনৈতিক ও কৌশলগত কারণে নানা দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

**শিনজিয়াং-এর জনসংখ্যার চিত্র ও উইঘুর**

শিনজিয়াং-এর অধিবাসীদের অধিকাংশই তুর্কি বংশোদ্ভুত এবং মুসলিম যারা মূলত হানাফী মাযহাবের অনুসারী। ১৯৪৯ সালের পূর্বে এখানে অমুসলিমদের সংখ্যা ছিল খুবই নগণ্য। চিনের বিভিন্ন স্থান থেকে হানদের এখানে ব্যাপক অভিবাসনের পরও ১৯৫৩ সালে এর জনসংখ্যার ৯০.৭% এবং ১৯৬৮ সালে ৭১.২% ছিল মুসলিম।[৬] ২০২০ সালের চিনের সরকারি আদমশুমারি অনুযায়ী শিনজিয়াং উইঘুর স্বায়ত্বশাসিত প্রদেশের জনসংখ্যা ২,৫৮,৫২,৩৪৫জন।[৭] এদের মধ্যে উইঘুর ৪৪.৯৬%, হান ৪২.২৪% এবং অন্যান্য ১২.৮০% (কাজাখ, কিরঘিজ, মোঙ্গল, তাজিক, উজবেক ও তাতার)।[৮] তবে চিনের এ আদমশুমারি দ্বারা শিনজিয়াং-এর জনসংখ্যার প্রকৃত চিত্র পাওয়া যায় না। একদিকে কয়েক দশক ধরে হানদের ক্রমাগত শিনজিয়াং-এ আগমন এবং অন্যদিকে উইঘুরদের বিদেশে পলায়ন, গণহত্যা, তাদের প্রতি জন্মনিয়ন্ত্রণ ও অন্যান্য নীতির ফলে উইঘুর সংখ্যাগরিষ্ঠ শিনজিয়াং প্রদেশে এখন তারা দ্বিতীয় বৃহত্তর নৃগোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে বলে কোনো কোনো সূত্র থেকে তথ্য পাওয়া যায়।[৯] শিনজিয়াং প্রদেশে উইঘুর ও হান ছাড়াও কাজাখ, কিরগিজ, মোঙ্গল, তাজিক, উজবেক এবং তাতার জাতিগোষ্ঠীর লোকেরা বসবাস করছে।

**উইঘুরদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস**

অষ্টম শতকে উইঘুররা মঙ্গোলিয়ার মধ্যভাগে ওরহোন নদীর (Orhon River) তীরে তাদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। তাদের এই রাজ্য উইঘুর খানেত (Uyghur Khaganate) নামে পরিচিত। ৭৪৪ থেকে ৮৪০ সাল অবধি তাদের রাজ্যটি টিকে ছিল। ৮৪০ সালে তাদের রাজ্য কিরঘিজদের হস্তগত। এরপর তারা মঙ্গোলিয়া ত্যাগ করে কানসু (Gansu) এবং শিনজিয়াং-এ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। সেখানে তারা দু'টি স্বতন্ত্র রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে:

১. বর্তমান কানসু এলাকায় প্রতিষ্ঠিত রাজ্যটি কানচৌ রাজ্য (Ganzhou Kingdom) নামে পরিচিত। ৮৭০ সালে (মতান্তরে ৮৯৪) সালে এ রাজ্যটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এ রাজ্যের উইঘুররা বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী ছিল এবং তারা কখনো ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়নি। ১০৩৬ সালে তাকুত রাজ্য (Tangut Kingdom) কর্তৃক দখলের মধ্য দিয়ে এ রাজ্যের পতন হয়।

২. বর্তমান শিনজিয়াং অঞ্চলের তারিম নদী অববাহিকায় (Tarim River Basin) প্রতিষ্ঠিত রাজ্যটি কোচো রাজ্য (Kingdom of Qocho) নামে পরিচিত হয়। ৮৪৩ সালে এ রাজ্যটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ত্রয়োদশ শতকে এ রাজ্যটি মোঙ্গলদের দ্বারা পদদলিত হয় এবং কোচো অঞ্চটি চাগতাই খানেত (Chagatai Khanate:1226-1705) রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

ট্রান্সঅক্সিয়ানা কেন্দ্রিক মূল চাগতাই রাজ্যটির শাসনকাল ছিল ১২২৬ থেকে ১৩৪৭ সাল পর্যন্ত। কিন্তু, ১৩৪৭ সালে ট্রান্সঅক্সিয়ানা তৈমুরীয়দের হাতে বিজীত হবার পর থেকে ১৪৮৭ পর্যন্ত এ রাজ্যটি মোঘুলিস্তান (Moghulistan:) নামে পরিচিত হয়। পরে মোঘুলিস্তান রাজ্যটি দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়: ইয়ারকেন্ত খানেত (Yarkent Khanate: ১৪৮৭-১৬৯০) ও তুরপান খানেত (Turpan Khanate: ১৪৬৫-১৭০৫)। উইঘুর অধ্যুষিত কোচো অঞ্চলটি ইয়ারকেন্ত খানেত রাজ্যের অধীনে চলে যায়। চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতকে তারিম নদী অববাহিকার উইঘুররা ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয় এবং এ সময়ে উইঘুরদের পূর্বতন ভাষার পরিবর্তে চাগতাই ভাষা প্রাধান্য লাভ করে। চাগতাই ভাষাও তুর্কি সমগোত্রীয় একটি ভাষা। তবে এ ভাষায় ফার্সি ও আরবী ভাষার প্রভাব রয়েছে। পঞ্চদশ শতকের পর কোচোর উইঘুররা নিজেদের উইঘুরের পরিবর্তে তুর্কি পরিচয় দিতে শুরু করে।

১৭০৫ সালে চাগতাই রাজ্যটি জাঙ্গারদের (Dzungars) দখলে চলে যায়। জাঙ্গাররা উইঘুরদের দাসত্বে আবদ্ধ করে। ফলে তারা জাঙ্গার রাজ্য দখলে কিনদের (Qing Dynasty: ১৬৪৪-১৯১১) সহায়তা করে। ১৭৫৫ সালে কিনদের দ্বারা জাঙ্গার রাজ্যের পতন হয়। পরবর্তী তিন বছর কিনরা জাঙ্গারদের উপর গণহত্যা চালিয়ে ৫লক্ষ জাঙ্গার অধিবাসীকে হত্যা করে যা মোট জাঙ্গার জনসংখ্যার শতকরা ৮০ভাগ। এরপর তারা আর ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি এবং তাঁদের পতনের পর উইঘুররা শিনজিয়াং-এ প্রভাবশালী জাতিতে পরিণত হয়। ১৮৮৪ সালে শিনজিয়াং অঞ্চলকে একটি প্রদেশে পরিণত করা হয় এবং সরকারিভাবে এর নামকরণ করা হয় শিনজিয়াং। শিনজিয়াং-এর শাব্দিক অর্থ নতুন সীমানা (New Frontier)। ১৯১১ সালের চিনা বিপ্লবের পর অভ্যন্তরীণ বিশৃংখলার কারণে উইঘুররা যুদ্ধবাজদের জোটে চলে আসে। ১৯২১ সালে রাশিয়ার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত তাসখন্দ সম্মেলনে তুর্কি নামের পরিবর্তে পূর্বতন নাম উইঘুর হিসেবে তাদের নতুনভাবে নামকরণ করা হয়। বিশ শতকের শুরুর দিকে তারা স্বাধীনতা ঘোষণা করে এবং দু'বার (১৯৩১-১৯৩৪ এবং ১৯৪৪-১৯৪৯) স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। ১৯৪৯ সালে চিন সরকার শিনজিয়াং-এর উপর পুনরায় মূল ভূখণ্ডের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করলে তাঁদের ভাগ্যে অমানিশার অন্ধকার নেমে আসতে থাকে।

**হান-উইঘুর উত্তেজনা**

১৯৫৫ সালে শিনজিয়াং একটি স্বায়ত্বশাসিত প্রদেশ হিসবে ঘোষিত হয়। এ সময়ের পর থেকে তাত্ত্বিকভাবে শিনজিয়াং স্বায়ত্বশাসিত অঞ্চল হলেও বাস্তবে এখানকার উইঘুরদের কেন্দ্রিয় সরকার কর্তৃক কঠোর বাধ্যবাধকতা ও অনুশাসনের দ্বারা চালিত হতে হয়েছে। শিনজিয়াং স্বায়ত্বশাসিত প্রদেশ হিসবে ঘোষিত হবার পর চিন সরকারের প্রত্যক্ষ নীতির কারণে চিনের অন্যান্য ভূখণ্ড হতে প্রচুর সংখ্যক হান এখানে উদ্দেশ্যমূলকভাবে আগমন করে। কয়েক দশক ধরে হানরা এখানে তাদের আভিবাসন অব্যাহত রাখে। অন্যদিকে, ১৯৪৯ সালের পর মাও জে দং-এর কমিউনিস্ট সেনাবাহিনী শিনজিয়াং-এর নিয়ন্ত্রণ নেয়ার পর ধর্মীয় ও রাজনৈতিক অত্যাচার হতে রক্ষা পেতে সেখানকার অনেক উইঘুর বিদেশে পাড়ি জমাতে থাকে। ১৯৫০ ও ১৯৬০-এর দশকে কমিউনিজমের ফলে সৃষ্ট কৃত্রিম দুর্ভিক্ষ (১৯৫৯-৬২) এবং চিনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের (১৯৬৬-৭৬) ফলে এই অবস্থা অব্যাহত থাকে। মূলত চিন সরকার সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময় প্রকাশ্যে ইসলাম ধ্বংস করার ঘোষণা দেয়।[১০] এ সময় উইঘুররা কাজাখস্তান, কিরঘিস্তান, তাজিকিস্তান, উজবেকিস্তান, আফগানিস্তান, পাকিস্তান ও তুরস্কসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পলিয়ে যেতে শুরু করে। বিশ শতকের শেষ দিকে এসে হানরা শিনজিয়াং-এর জনসংখ্যার দুই-

পঞ্চমাংশে পৌঁছায়। এর ফলে সেখানে উইঘুরদের সংস্কৃতি ও জীবন হুমকির সম্মুখীন হয়। হান ও উইঘুরদের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য, জাতিগত উত্তেজনা ও সংঘাত বৃদ্ধি পেতে থাকে।

হানদের দ্বারা বৈষম্যের শিকার হয়ে উইঘুররা তাদের অধিকার সংরক্ষণে প্রতিবাদী হয় এবং নব্বই-এর দশকে হান বিরোধী এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন গড়ে তোলে। East Turkestan Islamic Movement (ETIM) এ আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয়। ১৯৯৭ সালে হাসান মাহসুমের নেতৃত্বে পাকিস্তানে প্রতিষ্ঠিত এই সংগঠনটির লক্ষ্য হলো শিনজিয়াং-এর স্থলে পূর্ব তুর্কিস্তান নামক স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। ১৯৯০ এর দশকে চিন বলেছে যে, ETIM এর সাথে আল-কায়দা ও তালেবানদের সখ্যতা রয়েছে। ২০০২ সালে চিনের এক প্রতিবেদনে বলা হয় যে, ETIM সন্ত্রাসী সংগঠন থেকে অর্থ গ্রহণ করে। তাদের যোদ্ধারা আফগানিস্তানের তালেবানদের দ্বারা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। ETIM নেতা হাসান মাহসুম অবশ্য এ দাবী অস্বীকার করে বলেছিলেন যে, তাদের সাথে আল-কায়দা ও তালেবানদের কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই। যুক্তরাষ্ট্রও সে সময় বলেছিল যে সংগঠনটি আল-কায়দা থেকে প্রশিক্ষণ ও অর্থ গ্রহণ করছে। ২০০২ সালে যুক্তরাষ্ট্র এটিকে সন্ত্রাসবাদী সংগঠন হিসেবে কালো তালিকাভুক্ত করে। ২০২০ সালে অবশ্য দেশটি সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের তালিকা থেকে এটিকে বাদ দেয়।

২০০১ সালের ৯/১১ এর ঘটনার পর যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের (War on Terror) সুযোগ নিয়ে চিন সরকার উইঘুরদের সন্ত্রাসী ও চরমপন্থী হিসেবে আখ্যা দিয়ে তাদের উপর ব্যাপক দমন-পীড়ন শুরু করে। ২০০৯ সালে শিনজিয়াং-এ রাজধানী উরুমচিসহ বিভিন্ন স্থানে সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে। এতে প্রায় ২০০জন মানুষ নিহত হয় যাদের বেশিরভাগ হান। এছাড়া প্রায় ১৭০০জন আহত হয়। চিন উইঘুরদের দোষী সাব্যস্ত করে। এ ঘটনার পর সেখানে সহিংসতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ২০১১ সালে কাশগড়ে হান ও উইঘুরদের মধ্যে সংঘাতে ১৪জন মারা যায় এবং ৪০জন আহত হয়। চিন সরকার উইঘুরদের বিচ্ছিন্নতাবাদের জন্য অভিযুক্ত করে এবং অনেক উইঘুর মুসলিমকে বিভিন্ন সময় গুলিবিদ্ধ, গ্রেফতার এবং দীর্ঘ সময়ের জন্য কারারুদ্ধ করে রাখে। ২০১৪ সালের মার্চ মাসে ইউনান প্রদেশের কুনমিং রেল স্টেশনে ছুরিকাক্রমণের ঘটনায় উইঘুরদের অভিযুক্ত করা হয় এবং এপ্রিল মাসে চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং শিনজিয়াং প্রদেশে সফর করেন। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সরকারি সিদ্ধান্তের অংশ হিসেবে তিনি মূলত এ সফর করেন। এরপর সেখানে উইঘুরদের উপর নিপীড়ন আরও বৃদ্ধি পায়। ২০১৭ সালে চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং একটা আদেশ জারি করেন যাতে বলা হয়, "All religions in China should be Chinese in orientation"। তাঁর এ আদেশের পর পরই চিন সরকার উইঘুর অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে পুনরায় ব্যাপক দমন-পীড়ন (crack-down) শুরু করে। এই দমন-পীড়ন এখনও অব্যাহত রয়েছে। এ দমন-পীড়নের দ্বারা চিন উইঘুর সংস্কৃতির বিনাশ করতে চায়। সাম্প্রতিক সময়ে চিনের নিপীড়নে হাজার হাজার উইঘুর ইউরোপ, যুক্তরাষ্ট্রসহ বিভিন্ন দেশে পলিয়ে যায়।

## হুই মুসলিম[১১] ও উইঘুরদের মধ্যে শত্রুতা এবং চিনা নীতি

নৃতাত্ত্বিক বিচারে ২০২০ সালে চিনের সরকারি আদমশুমারিতে উইঘুর জনসংখ্যা হুইদের অপেক্ষা বেশি হলেও ধর্মের ভিত্তিতে চিনের মুসলিম জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক হুই মুসলিম (৪৮%)।[১২] প্রায় তিনশত বছর ধরে হুই ও উইঘুরদের মধ্যে শত্রুতা রয়েছে। নানা বিষয়ে তাদের মধ্যে শত্রুতা ও উত্তেজনা

বিরাজমান। উইঘুর মুসলিমদের মধ্যে হেরোইনসহ মাদক বিস্তারে তারা হুইদের দায়ী করে। হুইদের ভাষা চাইনিজ এবং তারা চিনকে নিজেদের ভূমি মনে করে। হুইদের ব্যাপারে চিনা সরকার অনেকটা নমনীয়। চিনা সরকার হুই মুসলিমদের উইঘুর মুসলিমদের মত বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনকারী নয় বলে মনে করে। মুসলিম দেশগুলোর সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য হুইদের ব্যবহার করা হয়।[১৩] উইঘুর ও হুই মুসলিমরা আলাদা আলাদাভাবে বাস করে এবং ভিন্ন ভিন্ন মসজিদে নামাজ পড়ে। হুই মুসলিমদের কিছুটা ধর্মীয় স্বাধীনতা থাকলেও উইঘুরদের উপর সরকার নানারকম নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেছে। বিভিন্ন উপায়ে তাদের উপর নিপীড়ন চালানো হচ্ছে। হুই মুসলিমদের ধর্ম পালন, মসজিদ নির্মাণ এবং মুসলিম সন্তানদের মসজিদে গমণে অনেকটা স্বাধীনতা প্রদান করলেও উইঘুর মুসলিমদের উপর এসব ক্ষেত্রে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়েছে। রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ তাদের মসজিদগুলোতে আযান দেয়া নিষিদ্ধ করেছে, মসজিদের মিনারগুলো ভেঙ্গে দিয়েছে এবং কিছু মসজিদ একেবারে ধ্বংস করেছে।[১৪] ১৯৮০র দশক থেকে হুইদের বেসরকারি ইসলামী স্কুলগুলো চিন সরকার কর্তৃক সমর্থন ও অনুমোদন পেয়েছে। তবে উইঘুরদের বিচ্ছিন্নতাবাদী অনুভূতির কারণে তাদের স্কুলগুলো অনুমোদন দেয়া হয় নি। উইঘুররা হুইদের মত রোজা রাখার অধিকার পাচ্ছে না। হুই নারীরা হিজাব পরিধানের অধিকার পেলেও উইঘুর মুসলিম নারীদের হিজাব পরিধান করতে দেয়া হয় না। হুইদের হজে গমনের অধিকার থাকলেও উইঘুরদের হজে গমনের জন্য পাসপোর্ট পাওয়া খুবই কঠিন। এমনকি অনেক উইঘুরকে হজ ছাড়া অন্য কাজের জন্যও বিদেশ যাত্রার পাসপোর্ট দেয়া হয় না।

অনেক ক্ষেত্রে চিনের নীতি সকল মুসলমানের ক্ষেত্রেই একই রকম। যেমন: সম্প্রতি চিন সরকার আরবী ভাষায় ধর্ম শিক্ষা নিষিদ্ধ করেছে। রেস্তোরা ও দোকানের আরবি নাম এবং ইসলামি বইয়ের মলাট ও দোকানের ঝাঁপে আরবি লেখা মুছে দিয়েছে। কোন মুসলিম এসব কাজের সাথে জড়িত থাকলে আটক করা হয়। আতি সম্প্রতি সকল মুসলিমের জন্য রোজা রাখা নিষিদ্ধ হয়।[১৫] হুইরা সরকারকে উইঘুরদের বিরুদ্ধে নানাভাবে সহযোগিতার পরও সাম্প্রতিক সময়ে বিশেষ করে ২০১৯ সালের পর থেকে হুই সংখ্যাগরিষ্ঠ নিংশিয়া ও কানসু প্রদেশের মুসলমানদের উপরও কড়াকড়ি বৃদ্ধি পেয়েছে। তাদের ধর্মীয় বিধি-বিধান পালনে বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়েছে। রোজা পালনে বাধা দেয়া হচ্ছে। মসজিদগুলো ক্ষতিগ্রস্ত ও ধ্বংস করা হচ্ছে। ফলে ধারণা করা যায়, ভবিষ্যতে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ ছোট ছোট এলাকাগুলোতেও একইভাবে কড়াকড়ি বৃদ্ধি করতে পারে চিন সরকার। চিনে মুসলমানদের উপর সরকারি নিপীড়ন এটাই নতুন নয়। কিং রাজবংশের শাসনামলে (১৬৪৪-১৯১১) মুসলমানদের উপর নীপিড়ন চালানো হয় এবং এসময় অসংখ্য মুসলমানকে হত্যা করা হয়। কেবল ডঙ্গান বিদ্রোহ [The Dungan Revolt (1862–1877)] দমন করতে গিয়ে ১ কোটি ২০ লক্ষ মুসলমানকে হত্যা করা হয়।[১৬] প্রজাতান্ত্রিক আমলে (১৯১১-১৯৪৯) চিনের পশ্চিম ও দক্ষিণাংশের মুসলমানরা বৈষম্যের শিকার হয়। কমিউনিস্ট আমলে (১৯৪৯ থেকে) চিনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময় (১৯৬৬-৭৬) মুসলমানদের উপর নিপীড়ন চালানো হয়। তাদের মসজিদগুলো ধ্বংস করা হয়, কুরআন ও ধর্মীয় গ্রন্থাদি দগ্ধ করা হয়, মুসলমানদের হজ্জ্ব পালন নিষিদ্ধ হয়। ১৯৭৬ সালে মাও জে দং-এর মৃত্যুর পর অবস্থার কিছুটা উন্নতি হলেও ৯/১১-এর ঘটনার পর থেকে নতুনভাবে মুসলমানদের উপর নিপীড়ন শুরু হয় এবং ২০১৭ সাল থেকে এই নিপীড়ন ভয়াবহ অবস্থায় পৌছায়।

### উইঘুরদের উপর নজরদারি

শিনজিয়াং-এর উইঘুরদের উপর ব্যাপক নেটওয়ার্ক নজরদারির মাধ্যমে কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করার অভিযোগ রয়েছে চিন সরকারের বিরুদ্ধে। তাদের মোবাইল ফোন ব্যবহারের উপর নজরদারির জন্য আলাদা সফটওয়্যার ব্যবহার করা হয়। স্পাইওয়ার সফটওয়্যারের মাধ্যমে অনলাইনে তাদের কথোপকথন পর্যবেক্ষণ করা হয়। তাদের চলাচলের উপর নানা ধরণের নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়। পুলিশ চেকপয়েন্টগুলোতে তাদের নিয়মিত হয়রানি করা হয়। মোটামুটি একশ গজ অন্তর এসব চেকপয়েন্টগুলো বসানো হয়েছে। চেকপয়েন্টগুলোতে সবকিছু স্ক্যান করতে পারে এমন সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে। তাদের নিয়ন্ত্রণের জন্য নিয়মিত পুলিশি প্রহরার ব্যবস্থা করা হয়। মুখমণ্ডল সনাক্তকারী ক্যামেরার মাধ্যমে তাদের কার্যকলাপের উপর নজরদারি করা হয়। উইঘুরদের বায়োমেট্রিক ডাটা সরকারি ডাটাবেসে সরবরাহ করা হয়। তাদের বাড়িঘরে কিউআর কোড বসানো হয়। এর মাধ্যমে একটি বাড়িতে কতজন সদস্য রয়েছে তা জানা যায়। অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা যায় এমন গৃহস্থালি জিনিসপত্রেও কিউআর কোড বসানো হয়। পুলিশ মোবাইল অ্যাপ ব্যবহারের মাধ্যমে জনগণের আচার-আচরণ পর্যবেক্ষণ করে। যেমন: তারা কতটা বিদ্যুৎ ব্যবহার করছে, কতবার তাদের ঘরের সামনের দরজা ব্যবহার করছে ইত্যাদি বিষয় পর্যবেক্ষণ করা হয় এসব অ্যাপের মাধ্যমে। চিনের আলীবাবা, আমাজন ইত্যাদি কোম্পানিগুলো এমন সফটওয়্যার তৈরি করেছে যা দিয়ে কোনো ছবি বা ভিডিও-এর মধ্যে উইঘুর থাকলে তাদেরকে ঐ সফটওয়্যার ব্যবহার করে সনাক্ত করা যায়। চিনা হ্যাকাররা ম্যালওয়্যার সফটওয়্যার দ্বারা গুপ্তচরবৃত্তি করে উইঘুরদের স্মার্ট ফোন থেকে তাদের ব্যক্তিগত তথ্য চুরি করছে। কমিউনিস্ট পার্টির গোপন প্রতিনিধিরা উইঘুরদের সন্দেহজনক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে কর্তৃপক্ষকে অবহিত করে। এছাড়া আরও অভিযোগ রয়েছে যে দাড়ি বড় রাখলে, নারীরা বোরখা পড়লে, বাড়িতে কুরআন রাখলে, পারস্পারিক সালাম বিনিময় করলে তাদের বিশেষভাবে চিহ্নিত করা হয় এবং তা কমিউনিস্ট কর্তৃপক্ষের নিকট অবহিত করা হয়।

### ক্যাম্পে বন্দি ও নির্যাতন

জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিটি ২০১৮ সালের এক প্রতিবেদনে বলেছে যে, চিন শিনজিয়াং-এর ১০ লক্ষের বেশি মানুষকে প্রশিক্ষণের নামে গোপন ক্যাম্পে বন্দি করে রেখেছে।[১৭] যুক্তরাষ্ট্র সরকারের অনুমান এসব ক্যাম্পে ২০ লক্ষের বেশি মানুষকে বন্দি করে রাখা হয়েছে।[১৮] অন্যান্য সূত্র থেকে জানা যায় যে, ক্যাম্পে বন্দি সংখ্যা প্রায় ৩০ লক্ষ।[১৯] Uyghur Human Rights Project (UHRP)[২০] এর মতে ২০১৭ সালে এসব ক্যাম্প নির্মাণ শুরু হয় এবং উপগ্রহের মাধ্যমে দেখা যায় যে এসব ক্যাম্পগুলো ক্রমাগত সম্প্রসারিত হচ্ছে।[২১] এসব ক্যাম্পে তাদের অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্দি করা হয়। ক্যাম্পগুলো খুবই সুরক্ষিত ভবনের মধ্যে অবস্থিত। এ ক্যাম্পগুলো অনেকটা মাও জে দং (১৯৪৯-১৯৭৬)-এর সময়ের পুনঃশিক্ষণ ক্যাম্পের মত। Australian Strategic Policy Institute (ASPI) ২০২০ সালে প্রমাণ পেয়েছে যে শিনজিয়াং-এ ৩৮০টির বেশি ক্যাম্প রয়েছে যা পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ৪০% বেশি।[২২] অন্য উৎস থেকে জানা যায় যে, সেখানে ৫০০টির মতো ক্যাম্প রয়েছে।[২৩] চিনের দৃষ্টিতে উগ্রপন্থী উইঘুর মুসলিমদের এসব ক্যাম্পে বন্দি করা হয়। মূলত দাড়ি রাখা, রমজানে রোজা রাখা, অন্যান্যদের থেকে আলাদা ধরনের পোশাক পরা, ঈদের শুভেচ্ছা

পাঠানো, ঘনঘন প্রার্থনা, ধুমপান-মদ্যপান না করা, মান্দারিন ভাষা না জানা এবং চিনের বাইরে কারো সাথে যোগাযোগ করা (বিশেষ করে বিদেশী বুদ্ধিজীবীদের সাথে) উইঘুরদের উগ্রপন্থী চিহ্নিত করে এসব ক্যাম্পে বন্দি করে আনা হয়। যেসব উইঘুর বিদেশে থেকে ফিরে আসে তাদেরকে চরমপন্থী হিসেবে সন্দেহ করা হয় এবং তাদেরকেও জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিয়ে আসা হয়। হিউম্যান রাইটস ওয়াচ এর মতে, ভ্রমণ বা পড়াশুনার জন্য বিদেশে গমণকারী উইঘুরদের কমপক্ষে দশ বছরের কারাদণ্ড দেয়া হয়।[২৪]

ASPI-এর মতে, শিনজিয়াং-এর ক্যাম্পগুলো উচ্চ নিরাপত্তায় পরিচালিত জেলখানা যেখানে কঠোর শৃঙ্খলায় বন্দিদের রাখা এবং শাস্তি প্রদান করা হয়। পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতন করা হয়। বন্দিদের শুকরের মাংস ও অ্যালকোহল সেবনে বাধ্য করা হয়। বন্দিদের প্রচণ্ড মারধর করা হয়। তাদের চেয়ারে বেধে চিনের প্রপাগান্ডা বলতে বাধ্য করা হয়। তাদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঝুলিয়ে রাখা হয়, কাঠের ও রাবারের লাঠি দিয়ে মারা হয়, বাঁকানো তার দিয়ে তৈরি চাবুক দিয়ে মারা হয়, চামড়ায় ফোসকানো সুচ ও নখ উপড়ে ফেলার প্লাস ব্যবহার করা হয়। তাদের মিথ্যা অপরাধ স্বীকার করানো হয়। এমনকি তাদের ঘুমাতে পর্যন্ত দেয়া হয় না। ২০১৯ সালে নিউইয়র্ক টাইমসের হাতে ফাঁস হওয়া চিনের কিছু নথি থেকেও তাদের উপর অত্যাচারের এসব চিত্র ফুটে ওঠে।[২৫] তাদের উপর অত্যাচারের আর একটি ভয়াবহ দিক হচ্ছে প্রশাসনের চোখের সামনে একটি চক্র দীর্ঘদিন ধরে বন্দিদের শরীরের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ বলপূর্বক অপসারণ ও কালোবাজারি করে কোটি কোটি টাকা আয় করছে। অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ন ভিত্তিক পত্রিকা *Herald Sun*-এর উদ্ধৃতি দিয়ে *Hindustan Times* (বাংলা) উল্লেখ করে যে, ছেদকৃত অঙ্গের মূল্য ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় সাড়ে ৭হাজার কোটি রুপি।[২৬] অন্য একটি উৎস হতে জানা যায় যে, চিন কালোবাজারে এসব ছেদকৃত অঙ্গের ব্যবসা করে প্রতিবছর কমপক্ষে ১বিলিয়ন ডলার আয় করে।[২৭] অঙ্গছেদের জন্য বন্দিদের ক্যাম্পের নিকটস্থ হাসপাতালগুলোতে নিয়ে যাওয়া হয়।

**বৈষম্যমূলক কর্মনীতি ও বাধ্যতামূলক শ্রম**

চিন সরকার উইঘুরদের উপর বাধ্যতামূলক শ্রম আরোপ করছে। বিশেষকরে ক্যাম্পে বন্দিদের জোরপূর্বক শ্রম প্রদানে বাধ্য করা হচ্ছে। বিবিসি ২০২০ সালে (ডিসেম্বর) এর এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করে যে, চিনের বন্দি শিবিরগুলোতে নতুন নতুন তুলা কারখানা গড়ে তোলা হয়েছে এবং এগুলোতে প্রতি বছর ৫লক্ষের বেশি সংখ্যালঘু শ্রমিককে জোরপূর্বক তুলা আহরণ করতে বাধ্য করা হয়।[২৮] জাতিসংঘ উইঘুরদের প্রতি বৈষম্যমূলক কর্মনীতি প্রয়োগ করার জন্য চিনকে অভিযুক্ত করেছে। এসব অভিযোগের মধ্যে রয়েছে বাধ্যতামূলক শ্রম, অসম্ভব উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ, দীর্ঘ কর্মসময়, কম বেতন ইত্যাদি।[২৯] জাতিসংঘ এসব বৈষম্য দূর করে তাদের জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টিতে জাতীয় ও স্থানীয়ভাবে নীতি নির্ধারণের আহবান জানায়। চাকুরি ক্ষেত্রে উইঘুরদের কোণঠাসা করে রাখা হয়েছে। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, চিন ১৯৬৪ সালের Employment Policy Convention এর অনেক আর্টিকেল ভঙ্গ করেছে।[৩০] ১৯৯৭ সালে চিন এই কনভেনশন অনুমোদন করে যেখানে স্বাধীনভাবে কর্ম বাছাইয়ের অধিকারসহ অনেক বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আইএলও-এর বাধ্যতামূলক শ্রমের ১১টি নির্দেশক নির্ধারণ করেছে যার মধ্যে অধিকাংশই উইঘুরদের ক্ষেত্রে দৃশ্যমান।[৩১]

ASPI-এর এক রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, ২০১৭ থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে ৮০হাজারের বেশি উইঘুরকে দেশের বিভিন্ন কারখানায় পাচার করা হয়েছে যাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক সরাসরি বন্দি ক্যাম্প থেকে পাঠানো হয়েছে।[৩২] তবে তাদের প্রকৃত সংখ্যা আরো অনেক বেশি। এছাড়া, ২০১৭ সাল থেকে শিনজিয়াং হতে চিনের ৯টি প্রদেশের ২৭টি কারখানায় তাদের স্থানান্তর করেছে বলে জানায় প্রতিষ্ঠানটি। International Trade Union Confederation (ITUC) একইভাবে চিনের বিপক্ষে কতগুলো অনুসন্ধানমূলক প্রতিবেদন তুলে ধরে। এ প্রতিবেদনে বলা হয়, বন্দিশিবিরে এবং বন্দি শিবিরের বাইরে শিনজিয়াং ও দেশের অন্যান্য স্থানের কর্মস্থানগুলোতে উইঘুরদের শ্রমের অপব্যবহার করা হচ্ছে।[৩৩] ITUC বলেছে যে, বন্দিশিবিরগুলোতে তাদের জীবন খুবই কষ্টের। সেখানে চলাফেরার স্বাধীনতা সীমিত এবং সেখানে উইঘুরদের শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করা হচ্ছে। তাদেরকে তুলা সংগ্রহ করতে এবং কাপড় ও জুতা তৈরিতে শ্রম দিতে বাধ্য করা হচ্ছে। বাড়ি থেকে দূরে এসব কারখানায় তাদের আলাদা করে রাখা হয়। কাজ শেষে তাদের মান্দারিন ভাষায় ক্লাস করতে বাধ্য করা হয়। কারখানায় তাদের কোনো ধর্মীয় কাজে অংশ নিতেও দেয়া হয় না।

### নারী ও শিশু নির্যাতন

উইঘুর জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য উইঘুর নারীদের জোরপূর্বক গর্ভপাত ও ব্যাপক বন্ধ্যাত্বকরণ করা হচ্ছে। *Reuters* জার্মানির একজন গবেষক জেনজ-এর সাম্প্রতিক (২০২১) এক গবেষণা উদ্ধৃত করে লিখেছে, জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্য চিন সরকার যে নীতি গ্রহণ করেছে তাতে শিনজিয়াং প্রদেশের উইঘুর ও অন্যান্য সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর অনুমিত জনসংখ্যা হতে আগামী ২০ বছরে এক-তৃতীয়াংশ কমে যেতে পারে। তার মতে, এ সময়ের মধ্যে ঐ প্রদেশের উইঘুর ও অন্যান্য সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর শিশু জন্ম ২৬ থেকে ৪৫ লক্ষ কমে যেতে পারে।[৩৪] কিছু বিশেষজ্ঞ চিনের এই আচরণকে "Demographic Genocide" (জনতাত্ত্বিক গণহত্যা) বলে উল্লেখ করেছেন।[৩৫] নারীরা গণধর্ষণ ও যৌন অপব্যবহারের শিকার হচ্ছে। যেসব নারী ক্যাম্প থেকে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করে তাদেরকে শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতন করা হয়। উইঘুর নারীদের হানদের সাথে জোরপূর্বক বিবাহ দেয়া হচ্ছে। উইঘুর শিশুদের পরিবার থেকে আলাদা করা হচ্ছে। তাদেরকে শ্রেণিকক্ষে মান্দারিন ভাষায় পাঠদানে অংশগ্রহণে এবং কমিউনিস্ট আদর্শের শিক্ষা গ্রহণে বাধ্য করা হচ্ছে। শিশুদেরও রোজা রাখার অনুমতি নাই। নবজাত শিশুদের ইসলামী নাম রাখা নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং প্রত্যেকটি মুসলিম সন্তানের মুসলিম পারিবারিক নামের পাশাপাশি চিনা মান্দারিন ভাষায় নাম রাখা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।।

### ধর্মীয় স্থাপনা ধ্বংস

ITUC বলছে যে, উইঘুরদের ধর্মীয় স্বাধীনতা হরণ করা হচ্ছে। তাদের ধর্ম ও সংস্কৃতি চর্চায় বাধা দেয়া হচ্ছে। *Herald Sun* বলছে যে, উইঘুরদের ধর্মীয় স্থানসমূহ ধ্বংস করা হচ্ছে। ASPI এর তথ্য অনুযায়ী ২০০৪ সালে শিনজিয়াং-এ ২৪,০০০ মসজিদ ছিল। এর মধ্যে ১৬,০০০ মসজিদ (৬৫%) সরকারের নীতির কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এর বেশিরভাগই ক্ষতিগ্রস্ত হয় ২০১৭ সালে। এর মধ্যে ৮,৫০০ মসজিদ পুরোপুরি ধ্বংস করে দেয়া হয়।[৩৬] ৩০% ইসলামী পবিত্র স্থান যেমন: দরগাহ, কবরস্থান, হজে যাবার পথ ইত্যাদি সম্পূর্ণ ধ্বংস করা হয়েছে, ২৮% ক্ষতিসাধন বা পরিবর্তন করা হয়েছে।[৩৭] UHRP এর তথ্য মতে, বেইজিং গত তিন বছরে শিনজিয়াং-এর ১০,০০০ হতে ১৫,০০০টি মসজিদ ধ্বংস

করে দেয় ।[৩৮] কিছু মসজিদকে পাবলিক টয়লেট ও মদের দোকানে পরিণত করা হয়।[৩৯] যেমন: শিনজিয়াং-এর টোকুল মসজিদটি সরকার সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেয় এবং সেখানে পাবলিক বাথ নির্মাণ করা হয়। এছাড়া আযনা মসজিদটি সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেয়া হয় এবং সেখানে অ্যালকোহল, সিগারেট ও তামাক বিক্রির দোকান গড়ে তোলা হয়।

**আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া**

জাতিসংঘ ২০১৮ সালে উইঘুরদের ক্যাম্পে বন্দি করা বন্ধ করতে চিনকে আহবান জানায়। উইঘুরদের দমন-পীড়ন ও হত্যাযজ্ঞের জন্য যুক্তরাষ্ট্র চিনের বিরুদ্ধে গণহত্যা ও মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগ আনে। ২০২১ সালের জুলাই মাসে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দফতরের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে চিন উইঘুরদের বন্দি, নির্যাতন, নারীদের জোরপূর্বক বন্ধ্যাত্বকরণ, নিষ্ঠুরতা ইত্যাদি মানবতাবিরোধী অপরাধ চালিয়ে যাচ্ছে। এসব কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত শিনজিয়াং-এর বেশ কয়েকটি কোম্পানিকে কালো তালিকাভুক্ত করে যুক্তরাষ্ট্র। যুক্তরাষ্ট্রের ঐ প্রতিবেদনে আরও উল্লেখ করা হয় যে, চিন সেখানে ১০ লক্ষ উইঘুর, কাজাখ, হুই ও অন্যান্য মুসলিম সংখ্যালঘুকে আটকে রেখেছে। কানাডার হাউস অব কমন্স ২৬৬-০ ভোটে উইঘুর মুসলিমদের প্রতি চিনের আচরণকে গণহত্যা হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে অভিহিত করে, যদিও প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো ও তাঁর মন্ত্রীসভার বেশিরভাগ সদস্য ভোটদানে বিরত থাকেন। ফলে যুক্তরাষ্ট্রের পর কানাডা দ্বিতীয় দেশ যা চিনা আচরণকে গণহত্যা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। যুক্তরাজ্য একইভাবে উইঘুরদের প্রতি চিনের জন্মনিয়ন্ত্রণ ও গণহারে বন্দি নীতিকে গণহত্যা বলে অভিহিত করে।

জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশনের রিপোর্টে (৩১ আগস্ট, ২০২২) চিনকে গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য অভিযুক্ত করে।[৪০] চিন বিরোধী আন্তর্জাতিক শক্তিগুলো উইঘুর সংকটকে চিনের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহারের জন্য উইঘুরদের পক্ষাবলম্বন করলেও মুসলিম বিশ্ব উইঘুর প্রশ্নে আশ্চর্যজনকভাবে নীরব। উন্নয়নশীল মুসলিম দেশগুলো অবকাঠামো ও জ্বালানিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে চিনের ব্যাপক বিনিয়োগ গ্রহণ করেছে এবং চিন থেকে ঋণ গ্রহণের দ্বারা দেশটির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে যা এই নীরবতার প্রধান কারণ। একথা সত্য যে, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া ও ভারতসহ চিন বিরোধী বিভিন্ন শক্তিশালী দেশগুলোর মিডিয়া এবং তাদের নিয়ন্ত্রিত আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থাগুলো উইঘুরদের প্রতি চিনের আচরণের বিরুদ্ধে সোচ্চার। তবে তাদের উদ্দেশ্য উইঘুর সংকটের সমাধান নয়, বরং এই সংকটকে রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে চিনের উপর ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি করা এবং আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক রাজনীতিতে চিনের ক্রমবর্ধমান প্রভাবকে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখা।

**আন্তর্জাতির প্রতিক্রিয়ার বিপক্ষে চিনের বক্তব্য**

যুক্তরাষ্ট্রসহ বিভিন্ন দেশ ও সংস্থার আনীত অভিযোগ ও প্রতিবেদন চিন সরকার বরাবরই অস্বীকার করে এসেছে। জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় উইঘুরদের ক্যাম্পে বন্দির নিন্দা জানালেও চিন সরকার শুরুতে এ ধরণের কোনো ক্যাম্পের অস্তিত্ব অস্বীকার করে। আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়ার মুখে ২০১৮ সালে (আগস্ট) UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination-এর নিকট ক্যাম্পের অস্তিত্ব চিন স্বীকার করে। তবে চিন বিভিন্ন সময় এসব ক্যাম্পকে Reeducation Center, Vocational Training Centers, Counter Extremism Centers, Poverty Alleviation Centers, Reeducation Through Labour, Political Training Centers, De

extremification Centers ইত্যাদি নামে অভিহিত করে। গণহত্যার ব্যাপারে চিনের বক্তব্য হচ্ছে, "A country can only be convicted of genocide by a competent international judicial institution with proper jurisdiction, in strict accordance with the requirements and procedures stipulated by the relevant conventions and international law."[৪১] চিনের দাবী সন্ত্রাসবাদ দূর করতে এবং ইসলামী চরমপন্থীদের সমূলে বিনাশ করতে দমন-পীড়ন জরুরী। চিন মনে করে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে পুনঃশিক্ষণ (reeducating inmate) একটি কার্যকরী ব্যবস্থা। চিনের দাবী, উইঘুর মুসলিম চরমপন্থীরা অস্থিতিশীল অবস্থা তৈরির মধ্য দিয়ে শিনজিয়াং-এ স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছে। চিন মনে করে, পুনঃশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোতে তাদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেয়া হয় যাতে তারা কর্মযোগ্য হয় এবং অর্থনীতিতে ভূমিকা রাখতে পারে। এছাড়া, দারিদ্র বিমোচনে এটি একটি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ। গণ-বন্ধ্যাত্বকরণের দ্বারা উইঘুর জনসংখ্যা হ্রাস করার অভিযোগও একইভাবে চিন অস্বীকার করে আসছে।

বাধ্যতামূলক শ্রমের অভিযোগ বিষয়ে চিনের বক্তব্য হচ্ছে যে এ অভিযোগ বানোয়াট ও মিথ্যা। চিনের জাতীয় দৈনিকপত্রগুলোতেও এ ধরণের গণগত্যা ও বাধ্যতামূলক শ্রমের অভিযোগ মিথ্যা হিসেবে উপস্থাপন করে। যেমন-ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত *China Daily* বারবার বাধ্যতামূলক শ্রমের অভিযোগ সত্য নয় বলে মত প্রকাশ করে। পত্রিকাটি বলেছে, যেসব বিদেশী কূটনীতিক, গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর প্রতিনিধিরা শিনজিয়াং ভ্রমণ করেছেন তাদের কেউই বাধ্যতামূলক শ্রমের দাবীর সত্যতা খুঁজে পায়নি।[৪২] চিন বাধ্যতামূলক শ্রমের বিষয়টিকে দারিদ্র বিমোচন, কারিগরি শিক্ষা, শ্রমের মাধ্যমে পুন:শিক্ষণ, চরমপন্থা মূলোৎপাটনের পদ্ধতি হিসেবে দেখছে। ২০২১ সালে চিনের State Council Information Office কর্তৃক প্রকাশিত এক শ্বেতপত্রে উইঘুরদের অধিকার সংরক্ষণের উপর জোর দেয়া হয়।[৪৩]

ITUC-এর অভিযোগসমূহের জবাবে চিনা বিবৃতির সারমর্ম নিম্নরূপ:

ক) মান্দারিন ভাষা শিখতে বাধ্য করার বিষয়ে বলছে যে, সংখ্যালঘু নৃতাত্ত্বিক সম্প্রদায়গুলোর শ্রমিকদের ভাষাদক্ষতা ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ভাষা শিক্ষা জরুরী।

খ) উইঘুর শ্রমিকদের কম বেতনের ব্যাপারে বলছে যে, সর্বনিম্ন বেতন ব্যবস্থা (minimum wage system) সমগ্র দেশব্যাপী প্রয়োগ করা হয়। কিছু অভিবাসী শ্রমিকদের মাসিক বেতন ১১৪ ডলারের কম-এই অভিযোগকে ভিত্তিহীন মনে করছে চিন।

গ) চিন বলছে, শিনজিয়াং-এর স্থানীয় সরকারের নিজস্ব শ্রম নীতি রয়েছে যা সকল শ্রমিকের অধিকার রক্ষা করে ও তাদের অভিযোগসমূহ দেখভাল করে।

ঘ) চিনের দাবী বন্দিদের বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রদান করা হয়।

ঙ) উইঘুরদের ধর্মীয় স্বাধীনতার ব্যাপারে বলছে যে, চিন দেশের ৫৬টি নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর মধ্যে সমতা নির্ধারণ করেছে। চিনের ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণের জন্য নীতিমালা রয়েছে এবং ধর্মগুলোকে সমাজতান্ত্রিক সমাজের সাথে মানিয়ে নিতে চিন সক্রীয়ভাবে পথনির্দেশ করে।

**উইঘুরদের প্রতি চিনের কঠোর নীতির কারণ**

আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়ার বিপক্ষে চিনের দাবীর অধিকাংশই সত্য নয়। বিশেষ করে বন্দিদের বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রদান করার দাবী অযৌক্তিক। কারণ সেখানে বন্দিদের অনেকেই রয়েছেন যারা অধ্যাপক, চিকিৎসক ও পেশাদার ব্যক্তিবর্গ। মূলত চিন চায় উইঘুরদের ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্পূর্ণ মুছে দিতে। চিনের উইঘুর নীতির মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা যায়, "At the heart of these repressive policies is China's aim of the 'de-Islamization' of Muslims or, as some call it, the 'Sinicization' of Islam."[৪৪] অর্থাৎ 'Sinicization' বা 'Sinification' (চিনাকরণ)-এর দ্বারা সাংস্কৃতিক অভিযোজনের, আত্তীকরণ নীতি অথবা সাংস্কৃতিক আধিপত্যবাদের মাধ্যমে মুসলমানদের চিনের সংস্কৃতির মধ্যে নিবিষ্ট করার প্রয়াস চালাচ্ছে চিন। চিনাকরণ নীতি দ্বারা মোঙ্গলিয়ান, তিব্বতী ও অন্যান্য সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর সংস্কৃতিকে গ্রাস করে চিনের মূলধারার সংস্কৃতির অর্থাৎ সংখ্যাগুরু হান প্রভাবিত চিনা সংস্কৃতির সাথে একাকার করতে চায়। এজন্য কিছু বিশেষজ্ঞ চিনের এ আচরণকে "a systematic, government-led program of cultural genocide" বলে আখ্যা দিয়েছেন।[৪৫]

মুসলমানদের প্রতি চিনের কঠোর নীতির আর একটি কারণ হলো, চিনে কমিউনিস্ট আদর্শ দৃঢ়ভাবে বজায় রাখার ক্ষেত্রে মুসলিম সম্প্রদায়কে বিশেষকরে উইঘুরদের সবচেয়ে সংগঠিত, কার্যকর ও বিপজ্জনক অভ্যন্তরীণ প্রতিপক্ষ মনে করে চিনা কর্তৃপক্ষ। এজন্য ৯/১১ এর ঘটনার পর যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সুযোগ নিয়ে চিন সরকারও উইঘুরদের সন্ত্রাসী ও চরমপন্থী হিসেবে আখ্যা দেয়। ইসলামকে সেখানে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এবং শিনজিয়াং অঞ্চলের স্থিতিশীলতার জন্য হুমকী হিসেবে উপস্থাপন করা হয় এবং সরকারি কর্মকর্তাদের মুসলমানদের বিরুদ্ধে দমন-পীড়নের বৈধতা দেয়া হয়। রাষ্ট্রীয় মদদে পরিচালিত মুসলিম বিরোধী প্রচারণার ফলে পশ্চিমা দেশের মত হানদের মধ্যেও ব্যাপক ইসলাম ভীতি (Islamophobia) প্রতিভাত হয় এবং হানরা স্বতস্ফূর্তভাবে উইঘুর সংস্কৃতি বিনাশে আত্মপ্রত্যয়ী হয়।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, হাজার হাজার বছর ধরে শিনজিয়াং উইঘুরদের আদি বসতভূমি। যুগ যুগ ধরে চিন সরকারের নানা নীতির কারণে তারা নিপীড়িত হয়েছে এবং তাদের স্বাভাবিক বিকাশধারা বাধাগ্রস্ত করা হয়েছে। ১৯৪৯ সালে কমিউনিস্ট শাসন প্রতিষ্ঠার পর থেকে ক্রমাগত হানদের অভিবাসনের দ্বারা  শিনজিয়াং উইঘুর স্বায়ত্বশাসিত প্রদেশে উইঘুর জনসংখ্যার হার আশংকাজনকভাবে কমানো হয়েছে। সাংস্কৃতিক বিপ্লব এবং নানা নীতির দ্বারা চিনা সংস্কৃতি জোরপূর্বক আত্মীকরণে বাধ্য করা হয়েছে। উইঘুরদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদী মানসিকতা সৃষ্টি এবং শিনজিয়াং-এ পূর্ব তুর্কিস্তান নামে স্বাধীন রাষ্ট্র গড়ে তোলার চেতনা উইঘুরদের উপর চিনের দীর্ঘদিনের দমন-পীড়নেরই ফল। ৯/১১ এর ঘটনার পর যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সুযোগ গ্রহণ করে চিন উইঘুরদের সন্ত্রাসী আখ্যা দিয়ে নতুনভাবে দমন-পীড়ন শুরু করে। এ দমন-পীড়নের কাজে হান, হুই এবং রাষ্ট্রীয় প্রশাসনযন্ত্রকে যুগপৎ ব্যবহার করা হয়। সাম্প্রতিক সময়ে উইঘুরদের ব্যাপক নেটওয়ার্ক নজরদারির মাধ্যমে তাদের উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ, মুখ সনাক্তকরণ সফটওয়্যার প্রয়োগ ইত্যাদির মাধ্যমে তাদেরকে নিপীড়িত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ে পরিণত করা হয়েছে। তাদের ব্যক্তি স্বাধীনতা কেড়ে নেয়া হয়েছে। পুনঃশিক্ষণ কেন্দ্র, কারিগরি শিক্ষা কেন্দ্র, দারিদ্র বিমোচন কেন্দ্র ইত্যাদি নামে কার্যত লক্ষ লক্ষ উইঘুরকে ক্যাম্পে বন্দি করে তাদের অমানবিকভাবে নির্যাতন করা হচ্ছে এবং তাদের মানবাধিকার চরমভাবে লঙ্গন করা হচ্ছে। তাদেরকে বিনা পারিশ্রমিকে বা কম পারিশ্রমিকে বৈষম্যমূলক

ও বাধ্যতামূলক শ্রমদানে বাধ্য করা হচ্ছে। উইঘুরদের উপর গণহত্যা চালানোর পাশাপাশি চিনাকরণ নীতির দ্বারা 'সাংস্কৃতিক গণহত্যা' এবং জন্মনিয়ন্ত্রণ নীতির দ্বারা 'জনতাত্ত্বিক গণহত্যা' চালানো হচ্ছে। ধর্মীয় স্থাপনা ধ্বংস এবং ধর্মীয় বিধিবিধান পালনে বাধা-নিষেধ আরোপ করে প্রত্যাহিক জীবনে তাদের ইসলামী কর্মকাণ্ডগুলো যথাসম্ভব কম দৃশ্যমান করার মাধ্যমে ধীরে ধীরে চিন থেকে ইসলামী প্রভাব মুছে ফেলতে চায় চিন সরকার। কারণ, রাষ্ট্রের সাংস্কৃতিক ঐক্য ও রাজনৈতিক সংহতি বিনষ্টের জন্য চিন সাধারণভাবে ইসলামকে এবং বিশেষভাবে উইঘুর মুসলিমদেরকে সবচেয়ে কার্যকরী শক্তি মনে করে। এজন্য কঠোর নীতি দ্বারা তাদের সংস্কৃতিকে অবলোপন করতে চায়। চিন উইঘুরদের উপর নিপীড়নের অভিযোগসমূহ অস্বীকার করলেও এসব অভিযোগ সর্বাংশে অসত্য নয়। তবে চিনের নিপীড়নমূলক নীতি গ্রহণের দায় উইঘুররাও পুরোপুরি এড়াতে পারেনা। উইঘুরদের উচিৎ বিচ্ছিন্নতাবাদী আচরণ ত্যাগ করে চিনা সমাজের মূল ধারায় প্রবেশের চেষ্টা করা। অন্যদিকে, চিন সরকারের উচিৎ উইঘুরদের নিজস্ব ধর্ম ও সংস্কৃতি চর্চার অবাধ স্বাধীনতা প্রদান করা এবং মানবিক অধিকার নিয়ে শান্তিপূর্ণ জীবন-যাপনের পথ প্রশস্ত করে দেওয়া। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় উইঘুর সংকট সমাধানে যে প্রক্রিয়ায় এগুচ্ছে তাতে এ সংকট সমাধানের তেমন কোনো সম্ভাবনা নাই। কারণ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরাশক্তি হিসেবে চিন বিভিন্ন দেশ ও সংস্থার অভিযোগ ও হুমকী মোকাবেলার ক্ষমতা রাখে। তাছাড়া, চিন ভালোভাবেই জানে, চিন বিরোধী আন্তর্জাতিক শক্তিগুলো চাইছে আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক পর্যায়ে চিনের প্রভাবকে একটা নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখতে যেখানে অন্যান্য বিষয়ের সাথে উইঘুর সমস্যাকেও ব্যবহার করছে তারা, সমস্যার সমাধান তাদের মূল উদ্দেশ্য নয়। এ সুযোগটাই নিচ্ছে চিন সরকার। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ধারণা করা যায়, বৈশ্বিক রাজনীতির ব্যাপক পরিবর্তন ছাড়া উইঘুর সংকটের পুরোপুরি সমাধান আপতত সম্ভব হচ্ছে না। ফলে উইঘুরদের স্বাভাবিক জীবন-যাপন ও আত্মপরিচয় নিয়ে যে সংকট তৈরি হয়েছে তা অব্যাহতভাবে চলমান থাকার আশংকা রয়েছে।

### তথ্যসূত্র ও টীকা

১ Raphel Israeli, *Islam in China* (New York, Lexington Books, 2002), 2.

২ Kelly Hammond, "The Terrible 'Sinicization' of Islam in China", *New Lines Magazine*, January 15, 2021, https://newlinesmag.com/argument/the-terrible-sinicization-of-islam-in-china/

৩ World Uyghur Congress হলো একটি আন্তর্জাতিক উইঘুর সংস্থা যা চিন ও চিনের বাইরে বসবাসকারী সকল উইঘুরের প্রতিনিধিত্ব করে। ২০০৪ সালে জার্মানির মিউনিখে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এর মূল উদ্দেশ্য হলো শান্তিপূর্ণ, অসহিংস ও গণতান্ত্রিক উপায়ে উইঘুরদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা এবং পূর্ব তুর্কিস্তানের (শিনজিয়াং) রাজনৈতিক ভবিষ্যত নির্ধারণ করা। এটি একটি ছাতা সংগঠন। World Uyghur Youth Congress, Uyghur American Association, East Turkistan Education and Solidarity Association, Uyghur Human Rights Project, Unrepresented Nations and Peoples Organization সংগঠনগুলো এর অধিভুক্ত।

৪ "WHO ARE THE UYGHURS?", World Uyghur Congress, Google, last modified April 4, 2023, https://www.uyghurcongress.org/en/

৫ স্বায়ত্বশাসিত অন্যান্য প্রদেশগুলো হলোঃ Guangxi (Zhuang অধ্যুষিত), Inner Mongolia (Mongol অধ্যুষিত), Tibet (Tibetan অধ্যুষিত), Ningxia (Hui অধ্যুষিত)।

৬ M. Ali Kettani, *Muslim Minorities in the World Today* (London, Mansell Publishing Limited, 1986), 101.

৭ ২০২০ সালে (১ নভেম্বর) চিনের ৭ম সরকারী আদমশুমারি অনুযায়ী দেশটির মোট জনসংখ্যা ১৪১,১৭,৭৮,৭২৪জন। এই আদমশুমারিতে ধর্মের ভিত্তিতে জনসংখ্যার তথ্য প্রকাশ করা হয় নি। নৃগোষ্ঠীর ভিত্তিতে প্রকাশিত জনসংখ্যা তত্ত্বে হানদের সংখ্যা ১২৮,৬৩,১০,০০০জন যা মোট জনসংখ্যার ৯১.১১%। চিনের ৫৬টি নৃগোষ্ঠীর মধ্যে ১০টি মুসলিম নৃগোষ্ঠী। এগুলো হলো: উইঘুর, হুই, কাজাখ, ডংশিয়াং, কিরগিজ, সালার, তাজিক, উজবেক, বোনান ও চাইনিজ তাতার। ২০২০ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী উইঘুর, হুই ও কাজাখদের সংখ্যা যথাক্রমে ১,১৭,৭৪,৫৩৮ (০.৮৪%); ১,১৩,৭৭,৯১৪ (০.৮১%) এবং ১৫,৬২,৫১৮জন (০.১১%)। এ আদমশুমারিতে বাকী ৭টি নৃগোষ্ঠীর সংখ্যা প্রকাশ করা হয়নি। ২০১০ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী ডংশিয়াং, কিরগিজ, সালার, তাজিক, উজবেক, বোনান ও চাইনিজ তাতারদের সংখ্যা যথাক্রমে ৬,২১,৫০০ (০.০৫%); ১,৮৬,৭০৮ (০.০১%); ১,৩০,৬০৭ (০.০১%); ৫১,০৬৯; ১০,৫৬৯; ২০,০৭৪ এবং ৩,৫৫৬জন।

৮ "Main Data of Xinjiang Uygur Autonomous Region from the Seventh National Population Census", Wayback Machine, Google, Published on June 16, 2021, https://www.fmprc.gov.cn/ce/cgtrt/eng/news/t1884310.htm

৯ "What you should know about China's minority Uighurs", Aljazeera, Google, last modified July 8, 2021, https://www.aljazeera.com/news/2021/7/8/uighurs-timeline

১০ M. Ali Kettani, *op.cit.*

১১ হুই মুসলিমরা পূর্ব এশিয়ার একটি নৃতাত্ত্বিক ধর্মীয় সম্প্রদায়। তারা চিনা ভাষায় কথা বলে। চিনের সর্বত্রই কম-বেশি তারা বিরাজমান। তবে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের প্রদেশগুলোতে তাদের আধিক্য বেশি।

১২ নৃতাত্ত্বিক বিচারে ২০২০ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী চিনে উইঘুর জনসংখ্যা (১,১৭,৭৪,৫৩৮জন) হুই জনসংখ্যা (১,১৩,৭৭,৯১৪) অপেক্ষা কিছুটা বেশি। কিন্তু, মুসলিম জনসংখ্যায় আধিক্যের ভিত্তিতে চিনের জাতিগুলো হলো যথাক্রমে হুই (৪৮%), উইঘুর (৪১%), কাজাখ (৬.১%), ডংশিয়াং(২.৫%), কিরগিজ, উজবেক, সালার, তাজিক, বোনান ও তাতার। "Muslims in China", China Highlights, last modified February 02, 2022, Google, https://www.chinahighlights.com/travelguide/muslim-china/#:~:text=The%20Hui%20people%20are%20the,minorities%2C%2010%20are%20predominantly%20Muslim.

১৩ Kelly Hammond, পূর্বোক্ত.

১৪ Kelly Hammond, প্রাগুক্ত.

১৫ "Banning of fast during Ramzan: China's systematic and merciless torture on Uyghur Muslims continues," Organizer, Google, last modified March 27, 2023, https://organiser.org/2023/03/27/166460/world/banning-of-fast-during-ramzan-chinas-systematic-and-merciless-torture-on-uyghur-muslims-continues/

১৬ "The Last Chinese Dynasty", *European Imperialism in East Asia, Google* , তথ্য সংগ্রহের তারিখ ১ অক্টোবর ২০২৪, https://courses.lumenlearning.com/suny-fmcc-boundless-worldhistory/ chapter/the-last-chinese-dynasty/

১৭ "U.N. says it has credible reports that China holds million Uighurs in secret camps," *Reuters*, Google, Published on August 10, 2018, https://www.reuters.com/article/us-china-rights-un-idUSKBN1KV1SU

১৮ "Concentration Camps in China for Uyghurs and Other Turkic Muslims," Uyghur Human Rights Project, Google, Published on January 26, 2019, https://uhrp.org/report/briefing-concentration-camps-china-uyghurs-and-other-turkic/

১৯ "List of Mosques converted into public toilets in China?," Ground Report, Google, last modified June 16, 2022, https://groundreport.in/list-of-mosques-converted-into-public-toilets-in-china/

২০ Uyghur Human Rights Project হলো একটি গবেষণা ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান যা উইঘুরদের মানবাধিকারের পক্ষে কাজ করে। এর অফিস ওয়াসিংটনে অবস্থিত। এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে গবেষণা ভিত্তিক প্রচার-প্রচারণার মাধ্যমে উইঘুরদের মানবিক ও গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করা।

২১ "Concentration Camps in China for Uyghurs and Other Turkic Muslims," op.cit

২২ "The Xinjiang Data Project," Australian Strategic Policy Institute, Google, last modified 2023, https://xjdp.aspi.org.au/about/

২৩ "Maps show 500 suspected 're-education' camps and prisons where China is locking up and torturing its Muslim minority", Insider, Google. last modified November 25, 2019, https://www.businessinsider.com/china-uighur-prison-camp-suspected-locations-maps-2019-11#:~:text=Activists%20have%20released%20a%20map,the%20country's%20western%20Xinjiang%20region.

২৪ "China: Free Xinjiang 'Political Education' Detainees," Human Rights Watch, Google, last modified September 10, 2017, https://www.hrw.org/news/2017/09/10/china-free-xinjiang-political-education-detainees

২৫ " Absolutely No Mercy': Leaked Files Expose How China Organized Mass Detentions of Muslims," *The New York Times*, Google, published on November 16, 2019, https://www.nytimes.com/interactive/2019/11/16/world/asia/china-xinjiang-documents.html

২৬ "উইঘুর মুসলিমদের উপর অত্যাচার! অঙ্গের কালোবাজারি করে কোটি কোটি টাকা আয় চিনে," *Hindustan Times বাংলা*, Google, last modified 7 November, 2021, https://bangla.hindustantimes.com/

২৭ "Liver on Sale: China harvested organs of Uyghur Muslims," *Ground Report*, Google, published on 30 October, 2021, https://groundreport.in/liver-on-sale-china-harvested-organs-of-uyghur-muslims/

২৮ John Sudworth, "China's 'tainted' cotton," BBC, Google, published on December 2020, https://www.bbc.co.uk/news/extra/nz0g306v8c/china-tainted-cotton

২৯ "China continues its labour abuse practices against Uighurs: UN," Aljazeera, Google, published on February 11, 2022, https://www.aljazeera.com/economy/2022/2/11/china-continues-its-labour-abuse-practices-against-uighurs-un

৩০ পূর্বোক্ত

৩১ The indicators are: Abuse of vulnerability, Deception, Restriction of movement, Isolation, Physical and sexual violence, Intimidation and threats, Retention of identity documents, Withholding of wages, Debt bondage, Abusive working and living conditions, Excessive overtime.

৩২ "Re-education', forced labour and surveillance beyond Xinjiang," Australian Strategic Policy Institute, Google, last modified March 01, 2020, https://www.aspi.org.au/report/uyghurs-sale

৩৩ "China continues its labour abuse practices against Uighurs: UN," Aljazeera, Google, published on February 11, 2022, https://www.aljazeera.com/economy/2022/2/11/china-continues-its-labour-abuse-practices-against-uighurs-un

৩৪ "EXCLUSIVE China policies could cut millions of Uyghur births in Xinjiang," *Reuters*, Google, Publishes on June 7, 2021, https://www.reuters.com/world/china/exclusive-amid-accusations-genocide-west-china-polices-could-cut-millions-uyghur-2021-06-07/

৩৫ Jeremy Goldkorn, “Demographic genocide’ in Xinjiang,” The China Project, Google, Published on June 29, 2020, https://thechinaproject.com/2020/06/29/demographic-genocide-in-xinjiang/

৩৬ “List of Mosques converted into public toilets in China?,” Ground Report, Google, last modified June 16, 2022, https://groundreport.in/list-of-mosques-converted-into-public-toilets-in-china/

৩৭ Nuriman Abdureshid , “China pushes the ‘Sinicization of religion’ in Xinjiang, targeting Uyghurs,” Radio Free Asia, last modified May 22, 2022, https://www.rfa.org/english/news/uyghur/sinicization-religion-05202022133914.html

৩৮ Shreya Chauhan, “Chinese Authorities Raze Mosque In Xinjiang, Reportedly Construct Public Toilet In Its Place,” *India Times*, Google, last modified August 18, 2020, https://www.indiatimes.com/trending/social-relevance/uighur-muslims-xinjiang-mosque-demolish-public-toilet-520564.html

৩৯ “List of Mosques converted into public toilets in China?,” Ground Report, Google, last modified June 16, 2022, https://groundreport.in/list-of-mosques-converted-into-public-toilets-in-china/

৪০ “China responsible for ‘serious human rights violations’ in Xinjiang province: UN human rights report”, *UN News*, United Nations, last modified August 31, 2022, https://news.un.org/en/story/2022/08/1125932

৪১ “China releases first white paper specifically on Xinjiang population”, last modified September 26, 2021, https://www.globaltimes.cn/page/202109/1235140.shtml

৪২ **“**Forced Labor' fallacy is doomed to shame”, last updated January 22, 2024, https://www.chinadaily.com.cn/a/202401/22/WS65adbc01a3105f21a507d80a.html

৪৩ **“**China Focus: China issues white paper on protecting rights of Xinjiang's ethnicgroups”, last modified July 14, 2021

৪৪ Kelly Hammond, পূর্বোক্ত

৪৫ **“**Despite China’s denials, its treatment of the Uyghurs should be called what it is: cultural genocide,” The Conversation, Google, last modified July 24, 2019, https://theconversation.com/despite-chinas-denials-its-treatment-of-the-uyghurs-should-be-called-what-it-is-cultural-genocide-120654